International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ: লোকসংস্কৃতির সন্ধান

রাজর্ষি রায়
গবেষক বাংলা বিভাগ বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র সমাসাময়িক সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সাহিত্যচর্চার সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আজকের দিনে তাঁর নাম কম আলোচিত হলেও সেকালের সাহিত্য জগতে তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরের খালকুলা গ্রামে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর। চাকরিসূত্রে বিজয়চন্দ্র নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। প্রথমে তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। সেই সূত্রে দীর্ঘদিন ওড়িশায় বসবাস করেন। সেখানেই তিনি ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ, পারিপার্শ্বিক মানুষ-পরিবেশ নিয়ে চর্চা শুরু করেন। আইন ব্যবসা এবং অধ্যাপনার কাজেও যুক্ত থেকেছেন বিজয়চন্দ্র। কবি হিসেবে সাহিত্য জীবনের সূচনা হলেও বিজয়চন্দ্র ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস বিষয়ক তাঁর বহুবিধ রচনা প্রকাশিত হয়। 'নব্যভারত', ভারতী', 'সাহিত্য', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বিভিন্ন ধরনের রচনা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় বিজয়চন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'ভীমভৈ বা নূতন অলেখ ধর্ম'। প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র তুলে ধরেছেন সোনা পুরের জঙ্গলে অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত এক নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা। ভীমভৈ নামে জঙ্গলে বসবাসকারী এক গরিব নিরক্ষর চাষী 'নূতন অলেখ ধর্ম' নাম দিয়ে এই নতুন ধর্মের প্রচার শুরু করেন। ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের সীমানার জঙ্গল এলাকা যেটি সে সময়ের সোনা পুর রাজ্যের অধীনে ছিল, সেই এলাকায় নতুন ধর্মটির উৎপত্তি ও বিকাশ। ধর্মের উৎস সম্বন্ধে বিজয়চন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, 'সমগ্র উৎকল দেশ একদিন বৌদ্ধভিক্ষুপরিপ্লুত ছিল। সে বহু দিনের কথা। হিন্দু রাজাগণ যখন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নবাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং করণজাতীয়েরা সর্ব্বত্র বৈদিক আচার এবং অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলেন তখন বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ পর্ব্বতগুহায়, বন প্রবেধ অনার্য্যজাতীয় গ্রামমধ্যে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিত। কুশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণির লোকের হস্তে পড়িয়া

বৌদ্ধভিক্ষুদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম অনেকটা বিকৃতি প্রাপ্তি হইয়াছিল। বৌদ্ধভিক্ষুদিগের তিরোধানের পর অতি বিকৃতভাবে অনার্যধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচজাতির মধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল অলেখ ধর্ম্ম তাহারই একটি'।[১] কুম্ভপটিয়া সম্প্রদায়ের 'অলেখ' ধর্মাবলম্বী কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন ভীমভৈ এবং তিনি এই ধর্মমতের কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে 'নূতন অলেখ ধর্ম্মে'র ভিত্তি নির্মাণ করেন। 'নূতন অলেখ ধর্ম্ম' লোকায়ত হলেও ভীমভৈর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সেকালের অনেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভীমভৈ তাঁর আদর্শ ও মতবাদ ভজনের মাধ্যমে গান গেয়ে বলতেন, তাঁর শিষ্যরা এই সব ভজন লিপিবদ্ধ করে প্রচার করে থাকত। এভাবেই এই ধর্ম প্রচারিত হয় এবং ভীমভৈর হাজারেরও বেশি শিষ্য নিয়ে এক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। নতুন এই ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ছিল মানবিক। গৃহ-সংসার অস্বীকার করে এই ধর্ম গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন কঠোরতা থেকে কিছুটা সরে এসে গৃহবাদী ধর্মে পরিণত হয়েছে বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে। সন্ন্যাসী প্রথা কিংবা বল্কলবাস এই নতুন অলেখ ধর্মে নেই। স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ কিংবা জাতিভেদ প্রথা এই ধর্মে নেই। ওড়িশায় প্রচলিত এই ধর্মমতের কিছু মানুষের সঙ্গে বিজয়চন্দ্রের আলাপ হয়। তাঁদের কাছ থেকে তিনি ভীমভৈ রচিত কীর্তন সংগ্রহ করেছিলেন। ওড়িশায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ইতিহাস আমাদের অজানা নয়, সেই ধর্মের পরিণতি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

লোকায়ত ধর্ম-দর্শনের পাশাপাশি লোকায়ত ব্রতকথার আলোচনাও বিজয়চন্দ্র করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' আষাঢ় ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিজয়চন্দ্রের 'কুমারী ওষা' প্রবন্ধ। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী থেকে শুক্ল অষ্টমী পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলার দুর্গাপূজার সময়ে পনেরো দিন ধরে এই ব্রত উৎসব হয়ে থাকে। সম্বলপুর এলাকায় কুলতা, ডোমর, শূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কুমারী মেয়েদের একবেলা উপবাস করে কুমারী দেবীর পূজা করার মধ্য দিয়ে এই ব্রতের নাম 'কুমারী ওষা' ব্রত। বিজয়চন্দ্র উপবাস থেকে ওষা শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেছেন। ব্রত পালনের কথা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন—'আশ্বিনের কৃষ্ণ অষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কুমারীরা স্নান করিয়া কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দিয়া, নূতন কাপড় পড়িয়া এক একখানি ডালা মাথায় করিয়া দল বাঁধিয়া গান গায়িতে গায়িতে বাহির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী বাজনদারেরা ঢাক, শানাই,ও কাড়া বাজাইতে বাজাইতে যায়। ...কুমারীরা গান

গাহিতে গাহিতে ডালা মাথায় করিয়া কুমারী দেবী গড়িবার জন্য মাটী আনিতে যায়, ...মেয়েরা বেলা প্রায় দশটপার সময় মাটী লইয়া ঘরে ফেরে এবং গান গাহিতে গাহিতে কুমারী দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া থাকে।'[২] কুমারী মেয়েদের দ্বারা মাটির পুতুল গড়ে পুজো করাই এই ব্রতের বৈশিষ্ট্য। অষ্টমীর রাতে কুমারীদের নাচ গানের পর্ব শেষ হয় এবং নবমীর দিনে পুতুল বিসর্জন করা হয়। সেদিন সমাজের সকল মেয়েরাই এই ব্রতে যুক্ত হয়ে নাচ গান করে। এই পর্বটিকে বলা হয় 'ভাই জিউতিয়া'। ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনায় এই অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণেরা পুজা করলেও তাঁদের প্রভাব বেশি নয়। কুমারী মেয়েদের গান নাচের ভাগই এখানে বেশি। এই নাচ গানকে 'ডালখাই' বলা হয়ে থাকে। এই মাটির পুতুল কোন দেবীর? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন এই দেবী বনদুর্গা। পৌরাণিক হরপার্বতীর থেকে এই দেবী আলাদা। সম্বলপুর এলাকার লোকায়ত সমাজে প্রচলিত ব্রতের সঙ্গে বঙ্গ দেশের মা দুর্গার মিল না থাকলেও মহাভারতের দুর্গা স্তোত্রের সঙ্গে মিল পেয়েছেন প্রাবন্ধিক। বিজয়চন্দ্র দেখিয়েছেন মহাভারতের দুর্গা স্তোত্রের দুর্গা কুমারী এবং বিন্ধ্যবাসিনী। সম্বলপুর থেকে বিন্দ্য পর্বতের দূরত্ব বেশি নয় এবং এই দেবীও কুমারী।

উত্তর ভারতে যেমন আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিল ঘটেছে তেমনি দক্ষিণ ভারতে আর্যরীতির সঙ্গে মিশতে দেখা যায় দ্রাবিড়ীয় ভারধারার। দুই ভিন্ন ধর্মী ভাবধারা মিলিত হওয়ায় তৈরি হয় নতুন ধরনের লোকাচার। মালাবার প্রদেশের নায়ার সম্প্রদায় সম্পর্কে বিজয়চন্দ্র মজুমদার একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩১৩ সংখ্যায়। 'মলবর-সুন্দরী' নামে এই প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র 'মলবর দেশ' বা কেরলের সমাজব্যবস্থা, জীবন সংস্কৃতির বিশেষ দিকগুলি অনুসন্ধান করেছেন। মলয় অঞ্চলের ঘরে ঘরে সর্পদেবতার আরাধনা করা হয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে বিজয়চন্দ্র এই অঞ্চলের কিংবদন্তি এবং ইতিহাসের কথা বলেছেন। প্রাচীনকালে সাপের ভয় থেকে সর্পপুজোর প্রচলন। নায়ার সমাজে বিবাহ ও সমাজ ব্যবস্থাও কিছুটা ভিন্ন। সে সম্পর্কে বিজয়চন্দ্র বলেন—'এদেশে বহুপতিত্ব প্রচলিত আছে।...আমরা যাহাকে বিবাহ বলি, নায়ার সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে চরিত্রের সংযম নাই সে কথা মিথ্যা। এদেশে নাম্বুদ্রি নামক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রীতি এই যে কেবল বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বজাতীয় কুমারী বিবাহ করিবেন, তদ্ভিন্ন অন্য পুত্রেরা নায়ার কামিনীদিগের প্রণয়ী হইবেন। নায়ার কুমারীরা স্বজাতীয় পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ

করিয়াই থাকেন, তাহার উপর ব্রাহ্মণ প্রণয়ী লাভেও তাঁহাদের অধিকার আছে। রমণীরা আপনার গৃহ পরিত্যাগ করেন না। যিনি পতি হয়েন তাঁহাকে পত্নীর গৃহে আসিতে হয়। পতি গমণ করিলেও রমণীর স্থান তাঁহর জন্ম ভবনে।

সন্তানেরা কোন পুরুষের পুত্র তাহা স্থির হওয়া সহজ ছিল না বলিয়াই হউক অথবা 'তারোয়াদ' সম্পত্তির বিশেষত্বের জন্যই হউক মাতার দ্বারা বংশ নিরূপিত ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব নির্ণীয় হয়। এ দেশের সকলেই 'পাণ্ডুনন্দন' না বলিয়া 'কৌন্তেয়' বলিতে হয়। মনে করুন যে, এক গৃহে এক জন পুরুষ ও তাহার ভগিনী বাস করেন। পুরুষটি অন্য গৃহে কোনো রমণীর প্রণয়ী। কিন্তু ভগিনীটি আত্মগৃহে সুস্থিরা। কাজেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন ভাগিনেয় বা বংশের অন্য কোন রমণীর সন্তান। এই জন্য এ দেশের উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের নাম 'মারুমকটায়ম'। দেশ ভাষায় 'মরুমকটায়ম' শব্দের অর্থেই ভগিনীর পুত্র।[৩] পরিবারের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নায়ার জাতির নারীদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সেরকম ভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও এই নারীদের প্রাধান্য দেখা যায়। এই সমাজের লোকউৎসবে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। বিজয়চন্দ্র মলবরের থিরুবথির উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উৎসবের গান, শোভাযাত্রা, বিলাপ সঙ্গীত সবকিছুই অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রীলোকের দ্বারা—'পর্ব্বের দিন অতিপ্রত্যুষে সূর্য্য উদয়ের পূর্বে প্রত্যেক গ্রামের ও নগরের তরুণীরা দলে দলে স্নান করিতে বাহির হয়েন। এ দেশে অনেক পুকুর। পুকুরেই স্নান কার্য সম্পন্ন হয়। সূর্য্য উদয়ের পূর্বেই সকলে এক একটি ডুব দিয়া জলে দাঁড়াইয়া মদন দেবের জন্য পরিতাপ করিয়া গান আরম্ভ করেন। দলের মধ্যে একজন মূল গায়িকা থাকেন, তিনি তারস্বরে ধূয়াটি গাহিলে পর সকলে অন্তরাটি গাহিতে থাকেন। প্রতি অন্তরার শেষে সঙ্গীতের তালজ্ঞাপক একটি জলশব্দ উত্তোলিত হয়।...সঙ্গীতের তালে তালে যখন যখন জলে এই ধ্বনি উঠে এবং রমণীদের সঙ্গীতধ্বনিতে পাখিরা জাগিয়া উঠিয়া গান গাহে তখন সূর্য্যদয় হয়। তখন স্নাতা সুন্দরীরা সূর্য্যালোকে গাত্রমার্জ্জনা করিয়া গৃহে ফেরেন। ঘরে গিয়া অল্পকিঞ্চিৎ জলযোগের পর সকলেই যত দূর সাধ্য উত্তম বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়েন। সজ্জায় দুইটি অঙ্গ কদাচ উপেক্ষিত হয় না,—পান চিবাইয়া ঠোঁট রাঙ্গা করা, এবং চোখে কাজল পরা। সাজগোজ করিয়া দলে দলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দোল খাইতে যাইতে হয়। সুসজ্জিতা স্নাতা তরুণীরা যখন গান গাহিতে গাহিতে দোল ক্ষেত্রে গমণ করেন তখন সেই রতি বিলাপ সঙ্গীতে নিশ্চয়ই মহাকালের হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সঙ্গীতের উদ্দিষ্ট দেব নব শরীর ধরিয়া বিচরণ করেন।'[৪]

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ: লোকসংস্কৃতির সন্ধান

নায়ার সমাজের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার নেপথ্যে রয়েছে সে অঞ্চলের প্রাচীন জনসমাজের প্রভাব। বহুদিনের প্রচলিত লোকরীতি বহু ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত হয়ে থেকে যায়। আবার বিশেষ কোনো প্রভাবে রীতিরপরিবর্তনও ঘটে। ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাবেরী তীরে' প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতির বিবাহের লোকাচারগুলি তুলে ধরেছেন। আর্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হলেও সেখানে আর্য সংস্কৃতিতে স্থানীয় লোকাচারের প্রভাবহ লক্ষ্যণীয়। এই প্রভাব থেকে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ সমাজেও বাদ যায়নি। এর ব্যাখ্যায় বিজয়চন্দ্র বলেছেন—'দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণেরা যেমন আর্য্যভাষা ত্যাগ করিয়া দ্রাবিড়ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন তেমনি বিবাহের অনুষ্ঠান প্রভৃতিতেও অনেক দ্রাবিড়জাতির প্রথা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।[৫] বিজয়চন্দ্র দেখিয়েছেন স্থানীয় প্রভাবেই আর্যরীতির বিবাহের সঙ্গে মিশেছে মাতুলকন্যার বিবাহরীতি কিংবা কন্যার গলায় তালি নামক সুতো বাঁধার অনুষ্ঠান। স্ত্রীলোকদের লাঠি খেলায় উৎসাহিত করার প্রথা প্রচলিত দক্ষিণ ভারতের চেরুমজাতির মধ্যে; ত্রিচিনাপল্লীর কল্লন জাতির বরকে তার শক্তি প্রদর্শন করার জন্য ষাঁড়ের শিঙে দড়ি বেঁধে টেনে আনার প্রথা দেখতে পাওয়া যায়; আবার কোয়েম্বাটুরের উরালি জাতির বর কন্যাকে একসঙ্গে অনেক দিনের জন্য স্থানান্তরে যেতে হয়, তাদের সন্তান জন্ম লাভ করলে তবেই বিবাহ অনুষ্ঠান হয়।[৬] আজকের দিনে এরকম বিচিত্র বিবাহ অনুষ্ঠান এক সময়ের লোকসমাজের বিভিন্ন প্রাথার সাক্ষী।

কবিতা রচনার পাশাপাশি বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন একজন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক। কবি হিসেবে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পরিচিতি একালে পাওয়া গেলেও তাঁর প্রবন্ধগুলি একালে বিশেষ আলোচনার মধ্যে আসে না। এর মূল কারণ তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। উনিশ শতকের শেষে থেকেই তিনি নিজের উৎসাহে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। প্রবাসে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন জনজাতি ভাষা, সংস্কৃতি,উৎসব,পার্বণগুলোকে দেখেছেন এবং সেই বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। তাঁর অধ্যবসায় এবং পণ্ডিত্য তাঁকে সাহায্য করেছে। গবেষনা এবং অনুসন্ধিৎসার কথা তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন। বিজয়চন্দ্র তাঁর কাজে বাঁধা দান করতে পারেনি। অন্ধ অবস্থাতেই তিনি সাহিত্য সেবা করে গেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্বান করেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার সেখানে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন। সেখানে তিনি ভাষাতত্ত্বর পাশাপাশি ছিলেন নৃতত্ত্ব বিভাগে।[৭] নৃতত্ত্বের প্রতি

আগ্রহে এবং নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি সেই সুযোগ লাভ করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য বিজয়চন্দ্রের রচনাগুলির প্রকাশ বিশ শতকের প্রথমদিকে। বিজয়চন্দ্রের রচিত এই প্রবন্ধগুলি ভ্রমণসাহিত্য বা সামাজিক প্রবন্ধ বলে সেকালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে লোক উপাদান যে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে যেখানে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, বর্ণ, ভাষার মানুষের বাস সেখানের সংস্কৃতি বিভিন্ন রঙে রঙিন। ওড়িশার জঙ্গলের লোকায়ত ধর্ম, সম্বলপুরের লোকসমাজের ব্রত বা দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও বিবাহে লোকাচারের যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন আজকের দিনে তার অনেকই হয়তো বিলুত্ব। তাই অল্প হলেও তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সেই তথ্যগুলি সঞ্চিত হয়েছে যা বর্তমানকালে অবদান রাখে।

উল্লেখপঞ্জি:

১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ভীমভৈ বা নূতন অলেখ ধর্ম, প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধায় সম্পাদিত, এলাহাবাদ, ১৩০৮ আশ্বিন ও কার্তিক, পৃ-২৮২।

২। ঐ, কুমারী ওষা, সাহিত্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, ১৩১৩ আষাঢ়,পৃ-১৫২-১৫৩।

৩। ঐ, মলবরসুন্দরী, সাহিত্য, ১৩১৩ বৈশাখ,পৃ-৩২-৩৩।

৪। তদেব।

৫। ঐ, কাবেরী তীরে, ভারতবর্ষ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন সম্পাদিত, ১৩২০ আষাঢ়,পৃ-১১।

৬। তদেব,পৃ-১১-১৪।

৭। সাইফুদ্দীন চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন, ঢাকা, ১৯৯৫ মে, পৃ-১৪।